‘নিমন্ত্রণ - পত্র’ না ‘আমন্ত্রণ - লিপি’

হরিপদ ভৌমিক

নিমন্ত্রণ এবং আমন্ত্রণ শব্দ দুটির সাধারণ অর্থ কিন্তু এক, কোন স্থানে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান। এই সাধারণ অর্থের বাইরে আর একটি অর্থ আছে, সেই অর্থ জানতে হলে আমাদের পৌঁছে যেতে হবে সেই প্রাচীন কালে। যখন গোষ্ঠিবদ্ধ সমাজ বড় হয়ে চারিদিকেছড়িয়ে পড়েছিল, তখন কাছের মানুষ দূরে চলে গিয়েছিল। এই দূরত্ব কমাতে সমাজপতিরা সামাজিক আইন করে নানান অনুষ্ঠান, পার্বন, উৎসবের মধ্যে দিয়ে সম্পর্কের সেতুবন্ধন করে দিয়েছিলেন। দূরের মানুষকে অনুষ্ঠানে কাছে পাবার জন্যই পাঠানোর ব্যবস্থা হয় অনুষ্ঠান পত্র। অনুষ্ঠানে তো সর্বসাধারণের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আহ্বান করা হলো, আবার নিকট আত্মীয় স্বজনকেও আহ্বান করা হলো। একই অনুষ্ঠানে বাইরের মানুষ সমালোচনা করলো, ঘরের মানুষ প্রশংসা করলো। আহ্বানকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরী হলো, আহ্বানকে দুটো ভাগে ভাগ করা হলো। যার কাজে নিন্দনীয়, ক্ষতি বা বিপরীত আচরণের ভাবনা থাকে, অথচ কবে, কোথায়, কোন সময়ে অনুষ্ঠান হবে তা জানিয়ে আহ্বান পত্র পাঠানো হলো -- সেই পত্রকে বলা হলো ‘নিমন্ত্রণ - পত্র’। আর খুব কাছের মানুষদের সঙ্গে আলোচনা করে, গুজনদের পরামর্শ মতো যারা কাজের নিন্দা করবে না, অনিষ্ট বা ক্ষতির চিন্তা করবে না, বিপরীত আচরণ করবে না, পূজার্চনায় মোক্ষ লাভের জন্য সহযোগীতা করবে এমন জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধবকে ত্রিয়া অনুষ্ঠানের আহ্বান পত্রটিকে বলা হলো ‘আমন্ত্রণ - পত্র’।

সাধারণতঃ আমরা অতিথি আপ্যায়নের জন্য নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণপত্রের কথা বলি। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী অতিথি আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ করা যায় না। কারণটা হলো, প্রাচীন কালে তিথি, নক্ষত্র বার দেখে বাড়ি থেকে মানুষ রাস্তায় বের হতেন। দূর দূরান্তেও হেঁটেই যেতে হতো। দূপুরে বা সন্ধ্যায় পথ ক্লান্তিতে কারো বাড়িতে রাত টুকু কাটাতে হতো, শাস্ত্রকারেরাও এমনটি নিয়ম করে দিয়েছিলেন, মনুযখন সামাজিক ইতিহাস ‘সংহিতা’ লিখলেন, তখনই (৩/৭০) গৃহস্থদের প্রতিদিন করণীয় পাঁচটি মহাযজ্ঞের কথা বলে দিলেন সেগুলি হলো (১) ব্রাহ্ম যজ্ঞ -- অধ্যাপনা (২) পিতৃ যজ্ঞ - তর্পণ (৩) দেবযজ্ঞ - হোম (৪) বালি - ভূতগনের অর্চনা (৫) নৃযজ্ঞ -- অতিথি পূজা।

অতিথিতে অর্থাৎ দিনক্ষণ না জানিয়ে আসার জন্য এই মানুষগুলিকে অতিথি বলা হলো। সুতরাং এদের তো আমন্ত্রণ বা নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং মিত্র ভোজন আর অতিথি সেবা কিন্তু এক নয়। মনু সংহিতায় (৩/১১০) তাই ‘বন্ধু, জ্ঞাতি ও গুকে অতিথি বলা যায় না’ বলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, ‘যার শ্রাদ্ধে ও দেবকার্যে মিত্র ভোজন করান হল, পরলোকে সেঐ কাজের কোন ফল পায় না’ (৩/১৩৯) । এসব প্রাচীন শাস্ত্রীয় কথা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিক অর্থে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়, যেমন হয়েছে ‘অতিথি’ শব্দটি। এখন অতিথি অ-তিথির মানুষ নয়, তিনি অনুষ্ঠানের আহ্বান - পত্র পেয়ে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হয়েছেন সম্মানিত অতিথি হয়ে।

অতিথিকে যেমন আলাদা করা হয় না, তেমনি আজ আর নিমন্ত্রণ - পত্র বা আমন্ত্রণ পত্রের বিষয়েও আলাদা করে ভাবায় না। বিবাহ, দুর্গোৎসবে সার্বজনীন নিমন্ত্রণ ও ঘরোয়া আমন্ত্রণের পার্থক্য এখন আর বোঝা না গেলেও সমগ্র বিষয়টি বোঝার জন্য পরের অংশটুকু পড়তে হবে।

বিয়ের চিঠি আমন্ত্রণ লিপি না নিমন্ত্রণপত্র?

আজকের দিনেও বিয়েৰ চিঠিতে উপরে ‘প্রজাপতয়ে নমঃ’ দিয়ে শু করা হয়। শুধু তাই নয়, খামের উপরে আবার একটা প্রজাপতির ছবিও লাগিয়ে দেওয়া হয়। এবার দেখা যাক প্রজাপতিটি কে? প্রাচীন ভারতে সমাজ যখন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, তখন ঐ গোষ্ঠীর দলপতিই দলের স্বামীত্ব বা প্রভুত্বের স্বীকৃতি পেয়েছিল। প্রজাদের পতি বলে দলপতি নাম পেয়েছিল ‘প্রজাপতি’। এইপ্রজাপতি বা রাজা দেবতার অংশবিশেষ বলে তখন ঘোষণা করা হয়েছিল। মনুসংহিতায় (১২/১১২) সে পরমপুষকে এই রূপে জানবে - তিনি সকলের শাসক, অনু থেকে সূক্ষ্ম, স্বর্ণাভ (অর্থাৎ জ্ঞানময়), স্বপ্ন ও বুদ্ধিগম্য’বলে শেষ করা হলো না; সঙ্গে (১২/১৩) যোগ করা হলো—

‘এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।।

—এঁকে কেউ বলে অগ্নি, কেউ প্রজাপতি, কেউ ইন্দ্র, কেউ প্রাণ, কেউ বা শাশ্বত ব্রহ্ম। প্রজার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে প্রজাপতি উপস্থিত না থাকলে অনুষ্ঠান যে অসম্পূর্ণ হবে, তা তাঁকে সামনে রেখেই যজ্ঞ করে সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথম প্রণামটি রাজাকেই দিতে হয়, তাই রাজসম্মানে বিবাহের পত্রে প্রথমে রাজপ্রণাম বা ‘প্রজাপতয়ে নম;’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বিবাহের যজ্ঞটিও প্রজাপতি যজ্ঞ নামেই এক সময় পরিচিত ছিল। মনু তাঁর সংহিতায় (৫/১৫২) ঐ যজ্ঞে কথা লিখেছিলেন — ‘মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞশ্চাসাং প্রজাপতে ’ অর্থাৎ স্ত্রীলোকে-র বিবাহে যে স্বস্ত্যয় বা প্রজাপতি যাগ করা হয় তা মঙ্গলের জন্য।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই ‘প্রজাপতয়ে নম ’ বলে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে পরে ‘যথাবিহিত সম্মান পুরসর নিবেদন মিদং শব্দে রাজার পার্ষদ এবং সম্মানিত গোষ্ঠিপ্রধানদের নিমন্ত্রণ জানানো হতো। সুতরাং গোড়াতে বিবাহের পত্র ছিল নিমন্ত্রণ পত্র। কে বা কারা কবে যে প্রজাপ্রতিকে প্রজাপতি পতঙ্গে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন তা আর জানা যায় না।

বিয়ের চিঠি প্রথমে ‘নিমন্ত্রণ পত্র’ থাকলেও পরে ‘আমন্ত্রণ লিপিতে’ রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু কবে থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন, তবে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ‘লেখপঞ্চাশিকা’ গ্রন্থে পঞ্চাশ রকম চিঠির বর্ণনা রয়েছেই। এই পঞ্চাশ রকমের মধ্যে কুঙ্কুম রঙে রঞ্জিত ‘কুঙ্কুমপত্র’ একটি। ১৪৭৭ খ্রীস্টাব্দের আগে লেখা একটি কুঙ্কুম পত্রিকার নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে’ ঐ সময়ে বিবাহের পত্রটি আমন্ত্রণ পত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে—

'অমুখ স্থানৎ মহং ...অমুকাক অমুকস্থানে যথাজ্ঞাতি সম্বন্ধং অমুকাকমান্ত্রয়তি যথা। অস্মদীয় সুতস্য অমুকমাসি অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকাকস্য অমুকাকসুতয়া পাণিগ্রহণং ভবিষ্যতি ইতি মত্বা ভবদ্ভি সকুটুম্বৈস্বরত্রাগন্তব্যম্।'

'অমুক জায়গা থেকে অমুক অমুক জায়গার জ্ঞাতি সম্বন্ধ মনে রেখে অমুককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আমার পুত্রের অমুক মাসের অমুক তিথিতে অমুকের কন্যা অমুকের সঙ্গে পরিণয় হবে একথা মনে রেখে আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে আসবেন।

আমন্ত্রণ হলো, একেবারে কাছের মানুষদের অর্থাৎ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধু - বান্ধবদের ডাকা। একটি বিয়ে যখন সামাজিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যায় তখন আর আমন্ত্রণ নয়, হয়ে যায় নিমন্ত্রণ। ঈশ্বরচন্দ্রর বিদ্যাসাগর বহু আন্দোলনেরর মধ্য দিয়ে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ১২৬৩ সনের ২৩ অগ্রহায়ণ তারিখে খাটুরা গ্রাম নিবাসী বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর বিয়ে ঠিক করেন। সামাজিক নিমন্ত্রণ সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দের জন্য সংস্কৃত এবং অন্যান্য দের জন্য বাংলায় লেখা হলো। মা বিধবা কন্যার বিয়ে দিচ্ছেন এই কারণ দেখিয়ে মায়ের জবানীতে কোন ছাড়া চিঠি দেওয়া হয়েছিল। দুটি চিঠির মধ্যে বাংলা চিঠিটি ছিল এইরকম --- "শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যা সবিনয়ং নিবেদনং। ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্বক কলিকাতার অন্ত পাতী সিমুলিয়ার সুকেশ ষ্ট্রীটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ন শকাব্দ ১৭৭৮।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর মহাশয় সামাজিক নিমন্ত্রণের কারণেই বিধবা বিবাহে 'পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ' করার কথা লিখেছেন। আজকের দিনে বিবাহ পত্রটি কিন্তু নিমন্ত্রণ পত্র না হয়ে আমন্ত্রণ - লিপিই হয়ে থাকে।

পত্রবাহক নাপিত

একটা সময় ছিল যখন সংবাদপত্র ছিলনা, কিন্তু সাংবাদিক ছিল, সেই সাংবাদিকদের নাম 'নাপিত'। এই বাবুর বাড়ির খবর ও বাবুবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সুপ্রাচীন ক াল থেকেই নাপিতরা সংবাদবাহকের সম্মান আদায় করে নিয়ে ছিল। সেই কারণেই বাড়ির শুভ কাজের সংবাদটি নাপিতকে দিয়েই পাঠান হতো। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম হয়েছিল মাতুলালয়ে। 'শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ লীলামৃত' গ্রন্থে (পৃ.৯- ১০) অমিয়কুমার সান্যাল নাপিতের দ্বারা এই জন্ম সংবাদটি বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল বলে জানিয়েছেন---

'নাপিতে আহ্বান করি বলে তখন।
ত্বরা করি শান্তিপুরে করহ গমন।।
বধূর কারণে তাঁরা আছেন চিন্তিত।
শুভ - বার্ত্তা প্রাপ্তে হবে বড় হরষিত
শান্তিপুরে সে নাপিত আসিয়া পৌঁছিল।
পুত্র জন্মিয়াছে এই সমাচার দিল।।
কৃষ্ণমণি দেবী হন আনন্দ মগন।
নাপিতেরে উপহার দেন বিলক্ষণ।।'

শুভ সংবাদের চিঠির সঙ্গে যেতো এক রকম বিশেষ মিষ্টি। সংবাদের সঙ্গে মিষ্টি যেতো বলে মিষ্টির নামও সংবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম হলো 'সন্দেশ শব্দের অর্থও সংবাদ। মহেন্দ্রনাথ দত্ত পুরনো দিনে কি ভাবে আমন্ত্রণপত্র নাপিত মারফৎ বিশেষ মিষ্টি সন্দেশ সহযোগে পাঠানো হতো তা জানিয়েছেন কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' (পৃ ৮-৯) নামক গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন---

"এখন কোন শুভকার্যে ডাকযোগে চিঠি পাঠান হয় এবং ইংরাজী কাগজে কালি দিয়ে লেখা হয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম ছিল না। দেশী তুলোট ক াগজে লাল কালি দিয়ে লেখা হতো এবং কাগজখানি চারিদিকে লাল সুতো বেঁধে কিছু মিষ্টির সঙ্গে নাপিতের হাতে যেতো। এতে নাপিতের কিছু প্রাপ্য হতো। পাছে নাপিত হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে ফেলে এইজন্য হাঁড়ির মুখে সরাটা উল্টেদিয়ে ময়দা গুলে চারদিকে লাগিয়ে দেওয়া হতো। তাকে ওলপ দেওয়া বলে। এইজন্য মেয়েরা পরস্পর ঠাট্টা করতো, 'ওলো, তুই যে মুখে ওলপ দিয়েছিস, তোর মুখে রা নেই'।

পরবর্তীকালে আমন্ত্রণে আন্তরিকতা আনতে কর্তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চিঠির সঙ্গে যেতেন সরকারবাবু। মেয়েদের আমন্ত্রণ মেয়েরাই করতো, এই পরিবর্তনের কথাও শুনিয়েছেন (পৃ.৫৯) শ্রদ্ধেয় মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়---

"বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে দিয়ে পাঠান হতো না। দূর দেশ হলে লাল কাগজে হাতে লেখা চিঠি নাপিত দিয়ে আসতো। কলকাতার ভেতর হলে সরকার বা অন্যকে - কর্তার ছেলে বা ভাই এসে নিমন্ত্রণ করতো। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে হলে বাড়ির মেয়েরা পাল্কি করে অপর বাড়ির মেয়েদের বলে আসতো। তখন নিমন্ত্রণে যাবে কিনা এই নিয়ে জটলা চলতো। তখন জাত, কুল, মান এই নিয়ে ঝগড়া বাদ - বিসম্বাদ হতো। নিমন্ত্রণ করা ও খেতে যাওয়া বড় ফেসাদের কাজহত। ছোট বেলায় আমি নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে বড় বিব্রত হয়েছিলাম।"

দূর্গাপূজার নিমন্ত্রণ

কর্তার ছেলেরা কি ভাবে দুর্গাপূজায় আমন্ত্রণ জানাতেন তা জানলে ভাল হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়কে। তিনি 'স্বরচিত জীবন - চরিত' - এ সেই প্রসঙ্গ - কথা লিখেছিলেন এইভাবে - "আমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আম াকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম - রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিনদিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ । শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ব্রাদার! আমাকে কেন; রাধাপ্রসাদকে বল।' এতদিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পা রিলাম।"

সেকালে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণে মজার ব্যাপার হলো, নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়ার কোন ঝামেলা কোন বাড়িতেই রাখা হতো না। এই বিচিত্র ব্যাপারটির বিষয় হুতে ামের চোখ এড়ায়নি, তাই 'দুর্গোৎসব' নকশায় লেখা হয়েছিল---

"এদিকে নিমন্ত্রিতেরা স্যেজে গুজে এসে টানাৎ করে অ্যাক্‌টা টাকা ফ্যেলে দিয়ে প্রণাম কল্লে, অমনি পুরত অ্যাক্ ছড়া ফুলের মালা নেমত্তন্নের গলায় দিয়ে টাকাটা কুড়িয়ে ট্যাকে গুঁজলেন, নেমত্তন্নেও হন্ হন্ করে চলে গ্যালেন। কলকাতা শহরের এই একটি বড় আজগুবি কেতা অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্ম্মকর্ত্তায় চোরে কাম ারের মত সাক্ষাৎও হয় না, কোথাও পুরোহিত বলে দ্যান 'বাবুরা ওপরে, ঐ সিঁড়ি মসাই জান্ না।' কিন্তু নিমন্ত্রিত য্যান চির - প্রচলিত রীতি অনুসারেই 'আজ্ঞে না অ ারো পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। থাক্' বলে টাকাটি দিয়েই অমনি গাড়িতে ওঠেন, কোথাও যদি কর্ম্মকত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবে গীরগীটের মত উভয়ে অ্যাক্‌বার ঘাড় নানা - নাড়ি মাত্র হয়ে থাকে -- সন্দেশ, মেটাই চুলোয় যাক্, পান তামাক মাথায় থাক্, প্রায় সর্ব্বত্রই সাদর সম্ভাষণেরও বিলক্ষণ অপ্রতুল...'

বাবু বাড়ির দুর্গাপূজার এই নিমন্ত্রণ বিষয়টি শুধু হুতোমী ভাষায় লিখে কালীপ্রসন্ন সিংহ ক্ষান্ত হন নি, একদিন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজাদের সে কথা শুনিয়ে

কেমন ভাবে নিজে নিমন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষকে খাইয়ে ছিলেন তা জানিয়েছেন অমৃতলাল বসু। তিনি স্মৃতি ও আত্মস্মৃতিতে (পৃ. ১০৯) লিখেছেন---

''কালীসিঙগী একবার পূজোয় রাজার বাড়ী নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, বৈঠকখানায় বসে আসেন। বিস্তর বড়লোক সেথায় জমায়েৎ ওদিকে উঠোনে নাচের মজলিস বসেছে, এমন সময় সেই নির্ভীক তেজস্বী স্পষ্টভাষী যুবক বলে উঠলেন, 'রাজার বাড়ী -- দূগ্‌গো পূজো-- নেমন্তন্ন আসা গেছে -- সেপাই খাও, শান্ত্রী খাও--- গোরা কনেষ্টবল খাও -- ফরাস তাকিয়া চেয়ার কউচ খাও, ঝাড় সেজ দেলগিরি বেললণ্ঠন যতপার খাও, বাইজীর সেঁইয়া বেঁইয়া খাও, কিন্তু লুচি - সন্দেশের যদি প্রত্যাশা কর ত সরে পড়।' মজলিসে একটা হাসি ও উঠল, একটা আমতা ভাবও কার কার মুখে দেখা গেল। রাজবাটীর প্রতিভূ ছিলেন তথায় হরেন্দ্রকৃষ্ণ, তিনি বিশেষ অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লেন, --- 'কি জানেন কালীবাবু, আমাদের বৃহৎ ব্যাপার, এই কলকাতার সাহেবই বলুন, মেমই বলুন, আর সমস্ত বড় মানুষ গুষ্ঠীত আছেনই, তাতে এই নাচের মজলিসের ব্যাপার, এর সঙ্গে কি আবার খাওয়ানর উদ্যুগ কল্লে সামলান যায়, ঐ জন্যে আমরা এর পর বাড়ী বাড়ী খাবার পাঠাই।

'সামলাতে পারা যায় কিনা, একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।' এই বলে সিংহ মহোদয় নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ী গেলেন। পর বৎসর হ'তে কয়েক বৎসর তিনি নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাস্তার দুধারে বাঁধা রোশনাই, বাড়ীতে উৎকৃষ্ট তরিকার মজলিস করে আর হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ করে পরিতোষ পূর্ব্বক ঐর্য্যের আয়োজনে ভূরিভোজন করিয়েছিলেন।''

দূর্গাপুজায় নেমতন্ন পেয়ে পূজো বাড়িতে এলে সেই অর্থে কর্মকর্তাদের দেখা যায় না, দেখা হলে বসার কথা বলেন না, বসলে খাওয়ার কোন বালাই নেই -- কাজের বাড়িতে যাওয়া যেন প্রণামী দেওয়াই প্রধান কাজ। হুতোমের মন্তব্য ছিল, প্রণামী দেওয়াটাই যদি প্রধান হয় তাহলে প্রণামীটা তো ডাকেও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। নিমন্ত্রণ পাওয়ার পর, নিমন্ত্রণ বাড়ির সেই দৃশ্য ও হুতোমের মন্তব্যটিরমজা গ্রহণ করতে এই অংশটুকু পড়তে হবে---

''দুই অ্যাক্ জায়গায় কর্ম্মকর্ত্তা জরির মছলন্দ প্যেতে সাম্‌নে আতরদান, গোলাপ্‌পাস সাজিয়ে পয়সার দোকানের পোদ্দারের মতবসে থাকেন। কোন বাড়ীর বৈঠকখানায় চোহেলের রৈ রৈ ও হৈ চৈয়ের তুফানে নেমন্তন্নের সেঁদুতে ভরসা হয় না -- পাচ্ছে কর্ম্মকর্ত্তা তেড়ে কামড়ান। কোথায় দরজা বন্ধ, বৈঠকখানা অন্ধকার, হয় তা বাবু ঘুমুচ্ছেন, নয় বেরিয়ে গ্যাছেন, দালানে জন মানব নাই, নেমন্তন্নে কার সমুখে যে প্রণামী টাকাটি ফ্যেল্‌বেন ও কি করবেন, তা ভেবে স্থির করতে পারেন না, কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দ্যোখে প্রতিমে পর্য্যন্তঅপ্রস্তুত হন। অথচ এ রকম নিমন্ত্রণ না কল্লেই নয়। এই দণ অনেক ভদ্রলোক আজ কাল আর 'সামাজিক' নেমন্তন্নে স্বয়ং যান না, ভাগ্‌নে বা ছ্যেলে পুলের দ্বারাতেই ত্রিয়ে বাড়ির পুতের প্রাপ্য কিম্বা বাবুদের ওৎ করা টাকাটি পাঠিয়ে দ্যান কিন্তু আমাদের ছ্যেলে পুলে না থাকায় ও স্বয়ং গমনে অসমর্থ হওয়ায় স্থির করেছি, এবার বিধি প্রণামীর টাকায় পোষ্টেজ্ ট্যাম্ব কিনে ডাকে পাঠিয়ে দেবো, ত্যামন ত্যামন আত্মীয় স্থলে (সেফ্ অ্যারইভ্যালের জন্য) রেজষ্টরী করে পাঠান যাবে; যে প্রকারে হোক্, টাকাটি পৌঁছনো নে বিষয়!''

মজলিসি নেমন্তন্নে

'মজলিসি নেমন্তন্নে' শব্দটি হুতোমের, বাবু বাড়ির উৎসবে আলাদা আলাদা ভাবে নিমন্ত্রণ পত্র তৈরী হতো। নাচ দেখার আলাদা চিঠি, একে আবার রসরাজ অমৃতলাল বসু 'টিকিট' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানিয়েছেন -- 'কৃষ্ণা নবমীতে এঁদের বাড়িতে বোধন বসে, সেদিন থেকে দু'বাড়িতে নাচ আরম্ভ, শেষ মহানবমীতে।' প্রথম পঞ্চমী পর্যন্ত রাজবাড়ির উপরের নাচঘরে মজলিস বসতো। ষষ্ঠীর দিন নাচ বন্ধ, আর পূজোর তিন দিন 'টিকিট না দেখালে ঢোকবার যো নেই, আর রাজার বাড়ীর একখানি টিকিট পাবার জন্য পরিচিত অন্য সাহেবের বা ক্রিস্ত বাবুদের সুপারিস ধরতেন। সাদা মুখের শোভায় রাজবাড়ীর উঠানে পদ্মফুলের মালা ফুটে উঠত আর আমরা কাল কাল অলিরা আশে পাশে ঘেঁষে ঘুঁষে গুঞ্জন করতুম।'

মজলিস শু হবার আগে থেকেই নেমন্তন্নেরা এসে কেমন ভাবে বাবুদের সঙ্গে বসে বাই নাচ ও গান উপভোগ করতেন তার সুন্দর বর্ণনাটি হুতোম থেকে না পড়লে বোঝা যাবে না--- ''এ দিকে উঠানের সমস্ত গ্যাস জ্বেলে দিয়ে মজ্‌লিসের উদ্‌যোগ হতে লাগলো, ভাগ্‌নেরা ট্যাসল দেওয়া টুপি ও পেটী পোরে ফপর দালালী কত্তে লাগ্‌লেন। এদিকে দুই অ্যাক্‌জন নাচের মজলিসি নেমন্তন্নে আস্‌তে লাগ্‌লেন। মজলিসে তয়ফা নাচিয়ে দেওয়া হলো। বাবু জরি ও কালাবৎ বার দিলেন। বাই সারঙ্গের সঙ্গে গান করে সভাস্থ সমস্তকে মোহিত কত্তে লাগ্‌লেন।''

ইনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাইনাচ কমে গিয়ে বাবু বাড়িতে নাটকাভিনয় শু হয়। এই অভিনয়ের জন্যও বিশেষ নিমন্ত্রণ পত্র ছাপা হত, উৎসাহী মানুষ এই নিমন্ত্রণ পত্র পেতেও আগ্রহী হতেন। সেই যুগের একটি নিমন্ত্রণপত্র ছিল এমনটি---

শ্রী শ্রীদুর্গা শরণং
শারদীয়া---
যথাবিহিত সম্মান পুর সর নিবেদন মিদং,
সৌর অশ্বিন্যা নম দিবসাবধি দিনচতুষ্টয়
মদীয় ভবনে শ্রী শ্রী মহাপূজা হইবেক। তদুপলক্ষে
চতুর্থ দিবসে বুধবাসরে রামকৃষ্ণপুর নিবাসী কতিপয়
মহোদয়গন কর্তৃক 'লক্ষণ শক্তিশেল'
গীতাভিনয় অভিনীত হইবে। অতএব মহাশয়েরা
সবান্ধবে পটলডাঙ্গাস্থ ভবনে আগমন পূর্ব্বক প্রতিমা
দর্শন এবং অভিনয় দর্শনে অভিনেতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন
করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি - সন ১২৮৩
সাল, ৫ই আশ্বিন।
--শ্রী দ্বারকানাথ বসু মল্লিকস্য

সময় কার হাত ধরে বসে থাকে না। রক্ষণশীল সমাজপতিগণ নানান নিয়ম - কানুনের মধ্য দিয়ে সমাজকে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সহজ গ্রহণযোগ্যতার কাছে প্রাচীন বহু প্রথা হারিয়ে গেছে। এ ভাবেই নিমন্ত্রণ ওআমন্ত্রণের মাঝে যে বেড়া ছিল, মানুষের অজান্তেই কখন যে ও দুটো এক হয়ে গেছে তা কেউ জানে না। এখন আর নিমন্ত্রিত বরযাত্রীদের হেনস্থা খতে আমন্ত্রিত আত্মীয়দের পাশে দাঁড়াতে হয় না। আমন্ত্রণ - নিমন্ত্রণের মিলন সামাজিক মিলন -- এ মিলনে সমাজেরই উপকার হয়েছে, একথা জোর দিয়েই বলা যায়।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com